The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.75 - 86)
Published in December, 2025

সলঙ্গার ঐতিহাসিক ঘটনা : হত্যাকাণ্ড পরবর্তী বিদ্রোহ ও মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের রাজনৈতিক ভূমিকা

সুলতানা সুকন্যা বাশার*

প্রতিপাদ্যসার: ব্রিটিশ বিরোধী যুগে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হয়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ পরিচালিত এক হত্যাকাণ্ড ঘটে সলঙ্গা নামক স্থানে। ইতিহাসে এ হত্যাকান্ড বরাবরই বিদ্রোহ হিসেবে উপস্থাপিত হলেও এটি ছিলো মূলত ভারতীয়দের শান্তিপূর্ণ এক অহিংস কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ হত্যাযজ্ঞের বিশেষ স্থান দখল করার কথা থাকলেও অদৃশ্য কারণে ঘটনাটি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পায়নি, এমনকি সমগ্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসেও স্থান পায়নি। বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে জানা যায় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের চেয়েও নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে সলঙ্গায় এবং এ ঘটনায় ব্রিটিশদের বিপক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কংগ্রেসপন্থী স্থানীয় নেতা মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। তৎকালীন উত্তরবঙ্গের মুসলিম জাগরণের অন্যতম সংগঠক ও কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাহচর্য লাভ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম' নামক সংগঠনে যোগ দেন এবং উক্ত সংগঠনে কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে যুক্ত হন কংগ্রেসের সাথে। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের অফিস গঠন করে ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে জোরালো ভূমিকা রাখেন। সলঙ্গা বাজারে তাঁর নেতৃত্বে বিদেশী পণ্য বর্জনে কর্মসূচীর পরবর্তী পদক্ষেপে ঘটে সলঙ্গার নির্মম হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় ইংরেজদের অভিযোগে তিনি প্রায় ছয় মাস কারাগারে শাস্তিও ভোগ করেছিলেন। উক্ত হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস স্থানীয় প্রবীনদের চেতনায় এখনো উজ্জীবিত। তবে, জাতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ গবেষণা হওয়া জরুরী, কেননা, বর্তমান প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী চেতনায় এ ইতিহাসের প্রভাব নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রবন্ধে সলঙ্গা হত্যাকাণ্ড এবং এতে কংগ্রেসপন্থী নেতা মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ- সলঙ্গা, হত্যাকাণ্ড পরবর্তী বিদ্রোহ, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, বিদেশী পণ্য বর্জন।

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠে। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের সমর্থনের আশায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা তা প্রত্যাখ্যান করলে ভারতীয়রা সকল সাম্প্রদায়িকতা আপাত ভুলে গিয়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। তাছাড়া, ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ বিচারপতি এস.এ.টি রাউলাটের নেতৃত্বাধীন কমিটি ৩রা মার্চের তৈরি ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টকে স্থায়ী রূপ দিতে বিপ্লবীদের বিশেষ আদালতে বিচারের রীতি প্রবর্তনসহ সরকারের বিরুদ্ধে যেকোন আন্দোলনকে শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা করায় সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর প্রেক্ষিতে ৩০ শে মার্চ হরতাল ও জনসভার ডাক দেয়া হলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে; যার দরুণ প্রতিদিনই ভারতের কোথাও না কোথাও থেকে সংগ্রামী কর্মীদের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে (মযহারুল ইসলাম ৪৯)। দেশব্যাপী এহেন

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তীব্র দমননীতি শুরু করে। ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই জনগণের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলতে থাকে। নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলিবর্ষণ, কারাগারে প্রেরণ নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে জনগন আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠে। মুক্তিকামী এ জনগণকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ছকে আবদ্ধ করতে মহাত্মা গান্ধী (১৮৮৩-১৯৪৪) সচেষ্ট হন।

ধর্মনিরপেক্ষ গণরাজনীতিক গান্ধী ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় মূল্যবোধকে রাজনীতির উপজীব্য করে তোলেন এবং অভিজাত রাজনীতিকদের সংগঠন কংগ্রেসকেও গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে একাধারে স্বরাজ, রামরাজ্য ও খিলাফত অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে হিন্দু-মুসলিম জনগনকে জাতীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করেন (হাসিনা আখতার ১৭)। ফলে, প্রতিটি জেলায় এমনকি থানা পর্যায়েও বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে উঠে। স্বেচ্ছাসেবক দলও গঠিত হয়েছিলো। পূর্ব বাংলায় এ আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। কেননা, শুধু বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চালানোর জন্য কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে কাজে লাগানো হয়েছিলো বলে জানা যায় (প্রেমেন আডডি, ইবনে আজাদ ৬২)। তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা নামক স্থানে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছিলো মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে। তিনি বহু আগে থেকে স্থানীয় সামাজিক অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করে সমাজপতিদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন। যাই হোক, ১৯২০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সাত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় (Ram Gopal 147)। উক্ত কর্মসূচির কতিপয় সংস্কারের সাথে বিলেতী পণ্য বিশেষ করে মাদক দ্রব্য বর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে মাওলানা তর্কবাগীশ কাজ করে যাচ্ছিলেন।

মূলত, মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপে পুরো দেশেই পিকেটিং এর ফলে কিছুটা সাফল্য এসেছিলো। যেহেতু, সলঙ্গা হাটে বিলেতী মদ সহজলভ্য ছিলো এবং একে কেন্দ্র করে স্থানীয় উশৃংখল যুবকরা মাদক সেবন ও জুয়া খেলার মতো আরো অনেক অসামাজিক কাজে জড়িত ছিলো বলে। এ সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতেই ১৯২২ সালে সলঙ্গায় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায় নির্মম হত্যাকাণ্ড। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ হত্যাকান্ড বিশেষ স্থান দখল করার কথা থাকলেও অদৃশ্য কারণে ঘটনাটি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পায়নি। স্থানীয় ভাবে সলঙ্গা হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস চর্চিত হলেও জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলোতে ঐতিহাসিক এ বিষয়টি স্থান পায়নি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে এমন আত্মত্যাগের ইতিহাস ভুলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বিধায় আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য

উক্ত প্রবন্ধটি সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে লিখিত কয়েকটি স্মরণিকায় জানতে পারি এবং গবেষণার প্রতি আকর্ষন বোধ করি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে সলঙ্গার বিষয়টি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য আমার নজরে আসেনি। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে সলঙ্গা বাজারস্থ মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগারের কার্যনির্বাহী সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু ঘটনা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করলেও সলঙ্গার ইতিহাসটি অজানা কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া প্রাপ্ত স্মরণিকা সমুহে সলঙ্গার ইতিহাসটিকে বিদ্রোহ অথবা 'হত্যাকাণ্ড' বলা হলেও এটি ছিলো মূলত 'হত্যাকাণ্ড পরবর্তী বিদ্রোহ'। কেননা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকারীরা কোন প্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করতেন না এমনকি কোন প্রকার গোলযোগও সৃষ্টি করতেন না। তাঁরা শুধু সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ইংরেজদের পরিকল্পিত উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে সলঙ্গার সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী

হয়ে উঠলে; ইংরেজরা গুলি চালানো শুরু করে। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সলঙ্গার ইতিহাসকে বিদ্রোহ বলা হলে তা অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। ঘটনাটি যে হত্যাকান্ড পরবর্তী বিদ্রোহের ইতিহাস সেটিই তুলে আনার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি পরিচালিত হয়েছে।

গৃহীত গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক এবং এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে প্রাথমিক উপাত্তে তৎকালীন গেজেটিয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বেশকিছু স্মরণিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থ। মাধ্যমিক উপাত্তে আলোচ্য ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকারসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার রয়েছে। মরহুম মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের পুত্র জনাব সৈয়দ শামসুল আলম হাসুর সাথে মুঠোফোনে কথা হয়েছিলো ২০২১ সালের আগস্ট মাসে। তাছাড়া, প্রবন্ধে উল্লেখিত দু'জন ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষৎকার নেয়া হয়েছে ২০২২ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে। সংগৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহের সত্যতা যাচাইয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করতঃ বই-পুস্তকের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

স্থানিক পরিচয়

ইংরেজ আমলে বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে পূর্ব বাংলার স্থানগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বারংবার বিভক্ত হয়েছে; যার ফলে ইতিহাসখ্যাত স্থানগুলোর তৎকালীন সীমারেখার সাথে বর্তমানের সীমারেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্যণীয়। প্রবন্ধের আলোচ্য ঐতিহাসিক স্থানটির প্রশাসনিক প্রয়োজনে স্থানিক নামের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভৌগোলিক ভাবেও যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ইতিহাসলব্ধ স্থানের সাথে স্থানীয়দের আবেগ এবং গর্বের বিষয়টি যুক্ত। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের নিকট শতাব্দীপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণে উক্তস্থানের তৎকালীন এবং বর্তমান অবস্থানের সঠিকত্ব জানা জরুরী।

সলঙ্গা নামক ঐতিহাসিক স্থানটি প্রাচীন ও বর্তমান স্থানিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। শত বছর পূর্বে এটি বর্তমান পাবনা জেলাভুক্ত হলেও এখন এটি সিরাজগঞ্জ জেলাভুক্ত। ফলে উভয় জেলার স্থানীয়রা সলঙ্গার ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার। মূলত, উক্ত জেলাদ্বয় পাশাপাশি অবস্থিত হলেও গঠনতান্ত্রিক ভাবে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. আয়েশা বেগম বলেন- 'পাবনরা জেলা কিছুদিন আগে পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ নামক দুটো মহকুমা নিয়ে গঠিত, যদিও বর্তমানে এগুলো পৃথক জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ভূ-সংলগ্নতার কারণে জেলা দুটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, যার কারণে যে কোন ক্ষেত্রে খন্ডিত বিশ্লেষন করার ক্ষেত্রে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে যে সমস্ত ঘটনাগুলো পূর্বের পাবনা জেলায় সংগঠিত হয়েছিলো, বর্তমানে সেগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভৌগোলিক নাম পরিবর্তন হয়েছে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে উভয় জেলার নাম উল্লেখ করতে হয় (আয়েশা বেগম ৩১)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮২৯ সালে তৎকালীন রাজশাহী হতে শাহজাদপুর, মথুরা ও পাবনা এবং যশোহর হতে কয়েকটি থানা নিয়ে পাবনা জেলা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ১৮৭৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত হয়ে বর্তমান যমুনা নদীর ধারা সৃষ্টি হলে সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ থেকে খারিজ হয়। আশালতা পত্রিকার লেখক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর মতে ১৮৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হতে সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ হতে পৃথক হয়ে পাবনা জেলাভুক্ত হয় (আখতার উদ্দিন মানিক ৫৭০-৫৭১)। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত উল্লাপাড়া উপজেলার একটি প্রসিদ্ধ পাটবন্দর

ও হাটের স্থান হলো সলঙ্গা (শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) ২৪-২৭)। ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কের হাটি-কুমরুল মোড় থেকে সোজা পশ্চিমের রাস্তা থেকে সলঙ্গার দূরত্ব হলো পাঁচ কিলোমিটারের কিছু বেশি। সিরাজগঞ্জ জিরো পয়েন্ট (কড়ইতলা, বাসস্ট্যান্ড) থেকে সলঙ্গার দূরত্ব হলো ২৫ কিলোমিটার। ১৯১৭ সালে সলঙ্গায় পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এটি স্বতন্ত্র থানার মর্যাদা লাভ করে (সাইফুদ্দিন চৌধুরী (সম্পা.) ১০৪)।

সলঙ্গা হাটের উৎপত্তি ও এর নামকরণের ইতিহাস

বৃহত্তর পাবনা তথা রাজশাহীর অন্যতম বৃহত্তম একটি হাট হলো সলঙ্গা। এ হাটের পত্তন সম্পর্কে স্থানীয় সূত্র মোতাবেক জানা যায় যে, বহু শত বছর পূর্বে সলঙ্গা নামক স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। এ অঞ্চলের কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপন্য বেচাকেনা করত হাটি-কুমরুলের নবরত্ন নামক একটি ছোট হাটে। এ হাটের নিকটবর্তী তাড়াশের জমিদারের কাচারী কর্মকর্তাদের উদ্যোগে প্রতিবছর জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী মেলা বসত ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে ঘিরে। নবরত্নের হাটুরেদের সাথে ঐ মেলার ব্যবসায়ীদের খাজনা জনিত বিরোধের জেরে পরবর্তীতে উল্লাপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ঈশ্বরচন্দ্র কুন্ডু স্থানীয় জমিদারের অনুমতিক্রমে বর্তমান সলঙ্গা হাটের দক্ষিণপ্রান্তে পাট কেনাবেচা আরম্ভ করেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও এস্থানে পাট কেনাবেচা করেন। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সলঙ্গা হাটের উৎপত্তি ঘটে। জনশ্রুতি মোতাবেক জানা যায় বর্তমানের সলঙ্গা এককালে জলমগ্ন ছিলো এবং সারাবছরই নৌকা চলাচল করত।

পশ্চিমের নিমগাছি থেকে পূর্বের দোগাছি পর্যন্ত অঞ্চলে নৌকাই ছিলো একমাত্র বাহন। বলা হয়ে থাকে এ এলাকাটি চলনবিলের সাথে যুক্ত ছিলো। কারণ এখানকার জনপদ গুলোর নামকরনে 'দহ', 'ঘাট', 'চর' ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায় যেমন- 'আলীদহ' 'সামাইল দহ' 'রামারচর', 'কুতুবের চর', 'সলঙ্গার চর' ইত্যাদি। সলঙ্গা হাই স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট বাংলা ভাষাবিদ জনাব আব্দুল আজিজ বি.এ. বি.টি সলঙ্গার নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন যেহেতু 'সল' শব্দের অর্থ জল এবং অঙ্গ অর্থ শরীর, সেহেতু এক সময়ের জলমগ্ন ভূমিকে সলঙ্গা বলা হয় (কালিপদ কুন্ডু ১৬-১৭)। আভিধানিকভাবে এর ব্যাখ্যা হলো সলিল শব্দের ভগ্নাংশ হলো সল+ইল = 'সল' (জামিল চৌধুরী (সম্পা.) ১৩০৯) শব্দটি মূলত জল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে 'অঙ্গ' বলতে 'শরীর' বোঝানো হয়েছে (জামিল চৌধুরী (সম্পা.) ০৬)। 'অঙ্গ বলতে ভূমি বা মাটিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সলঙ্গা বোঝাতে জলপূর্ণ ভূমি বোঝানো হয়েছে।

হাটের উৎপত্তি ও এর উন্নয়নে ব্যবসায়িক পটভূমি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রায় সমগ্র তাড়াশ থানা, উল্লাপাড়া থানার উত্তর ও পশ্চিমাংশ, শেরপুর থানার দক্ষিণাংশসহ পুরো রায়গঞ্জ থানার উৎপাদিত কৃষিজ পন্য এ হাটেই বিক্রয় করা হত। সেই সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এ হাট থেকেই কিনতো, পরবর্তীতে এ হাটকে কেন্দ্র করে বিশাল এক জনপদ গড়ে উঠে।

সলঙ্গার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও তৎকালীন রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশ

১৯১৪-১৯১৯ পর্যন্ত চলমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে জনবল ও অর্থবল যুগিয়ে ব্রিটিশদের আর্থিক সহযোগিতা করলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশদের আক্রমণাত্মক আচরণে ভারতীয়রা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজ এতে মর্মাহত হয়েছিল বেশি। কারণ, ১ম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো তুরস্ক। ভারতীয় মুসলমানেরা তুরস্কের প্রতি তখন সহানুভূতিশীল ছিলো। যুদ্ধের পর তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্রিটিশরা ভেঙ্গে দিয়ে ছিলো। এর ফলে মুসলমানেরা শুরু করেছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন (হোসেন উদ্দীন হোসেন ২৯৬)। রাওলাট আইন পাশ,

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ড, তুরস্কের প্রতি অন্যায় আচরণে ভারতের হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হয়ে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা ছিলো খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। একই সাথে সরকারের নির্বিচার দমননীতির প্রতিবাদে গান্ধীজির বদৌলতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিলো (সত্যেন সেন ১২২)।

এ আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলো হলো সম্মানসূচক অবৈতনিক পদসমূহ বর্জন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থা থেকে সরকার মনোনীত সদস্যদের পদত্যাগ, সরকারি ও আধা সরকারি স্কুল কলেজের পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, আইনজীবীদের ব্রিটিশ আদালত বর্জন করা, আইনসভার নির্বাচন বয়কট করা, বিদেশী পন্য বর্জনসহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠাকরণ, চরকার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, খদ্দরের পোশাক পরিধান এবং হিন্দু-মুসলমান অস্পৃশ্যতা বর্জন এ আন্দোলনের মূলমন্ত্রে পরিনত হয়েছিল। উল্লেখ্য, কুড়ি মাস ধরে হিন্দু-মুসলমান একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বরাজ ও খিলাফতের জন্য চলমান অভূতপূর্ব প্রচার কার্যক্রমের জন্য গঠিত কাউন্সিলগুলো বিভিন্ন জেলা ও থানা পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল শান্তিপূর্ণভাবে (শান্তিময় রায় ১৩৯৫ বঙ্গ, ৫৮)। যদিও সম্মিলিত এ মিত্রতা ছিলো সাময়িক (মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান ১৪)। যাই হোক, ভারতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের এ পর্যায়ে ১৯২১ সালের শেষের দিকেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল (মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী ৬৫)।

আইন অমান্যের মাধ্যমে পরিচালিত এ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিই প্রমাণ করে এটি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও অহিংস একটি আন্দোলনের রূপধারণ করে, যা পূর্ব বাংলায় তথা গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলো (Ashraf Siddiqui 41)। ১৯২২ সালে এ বর্জননীতিকে কেন্দ্র করেই সলঙ্গায় ঘটে যায় রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ড। স্থানীয়দের বিদেশী পণ্য বিশেষত মদ কেনা বেচা সহ অসামাজিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সলঙ্গা হাটের জনসমাগমে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন কংগ্রেসপন্থী নেতা মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। খবরটি পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাটে উপস্থিত হয় এবং আব্দুর রশীদকে আক্রমণ করে। এতে হাটুরেরা ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। বিক্ষুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে পুলিশ বাহিনী তাদের উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে মুহূর্তেই রক্তক্ষয়ী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার স্থানীয় মুসলিম নেতৃত্ব হিসেবে আব্দুর রশীদ নিঃসন্দেহে বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। যদিও তিনি আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে আসেন নি। পারিবারিকভাবে ইসলামী মতধারায় বেড়ে উঠেছিলেন বলেই সম্ভবত রাজনীতিতে যুক্ত হবার আগে থেকেই স্থানীয় সমাজপতিদের নানা অসামাজিক কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন তিনি।

পরবর্তীতে কংগ্রেসে যোগদানের ফলে একজন রাজনীতিকের তকমায় পরিচিত হন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে। এ আন্দোলন মুসলমানদেরকে সর্বপ্রথম আন্দোলনমুখী করে তোলে, যা শুধু গণআন্দোলন নয় বরং এটি তখন রিলিজিও পলিটিক্যাল মুভমেন্টে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো (মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী; ৪৭, ৪৯, ৫৪)। কেননা, ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে এর পূর্বে কখনোই মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজকে দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনিসুজ্জামান বলেন- "তৎকালের বাঙ্গালি মুসলমান নেতৃত্ব মাত্রই উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজকে ইঙ্গিত করত। কেননা, মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের বিকাশ তখনো ঘটেনি যার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে এ সমাজকে সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে কংগ্রেসের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে গিয়ে হামলার শিকার হন এবং ইতিহাসে তাঁর নামটি স্থান পায় (আনিসুজ্জামান ১০০)। মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিতে উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতৃত্ব সেক্ষেত্রে স্পষ্টতা আনতে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিল এবং সফল হয়েছিল।

সলঙ্গা হত্যাকান্ডের ঘটনা

১৯২১ সাল থেকে আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠে। প্রতিটা শহরে, গ্রামে, হাট বাজারে বিদেশী বস্ত্রসহ অন্যান্য দ্রব্য বর্জনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা দফায় দফায় অভিযান চালায় (Nurul Islam Khan 50)। তেমনি এক অভিযানে পুলিশ বাধা প্রদান করে ১৯২২ সালের ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবারের চান্দাইকোনা হাটে। এটি বগুড়া ও পাবনার সীমান্তবর্তী একটি হাট। সে হাটে স্বেচ্ছাসেবকদের বিলেতী পণ্য বর্জন কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিলে সাধারণ জনগণ উত্তেজিত হয়ে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে হাট সংলগ্ন ফুলঝোর নদীতে ফেলে দেয়। এতে পুলিশ কংগ্রেসকর্মী ও জনসাধারনের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে এবং পরবর্তী কর্মসূচিতে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাঘত সৃষ্টির সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ ঘটনার মাত্র ৩ দিন পর সলঙ্গা হাটে একই আন্দোলনের খবর পেয়ে স্বেচ্ছাসেবকসহ সাধারণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। সেদিন ছিলো শুক্রবার, ২৭ জানায়ারি। স্বাভাবিকভাবেই শুক্রবারের হাট হয় বিস্তৃত পরিসরে। যেহেতু, সলঙ্গা ছিলো উত্তরবঙ্গের বর্ধিষ্ণু হাট, তাই সেদিনের হাটে পাবনা, কুষ্টিয়া, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, টাঙ্গাইলসহ পার্শ্ববর্তী বহু জেলার মানুষ বিভিন্ন রকম পণ্যসহ গো-মহিষ আনতো বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। বেশিরভাগ পণ্য আনা হতো নৌপথে।

ফুলঝোর নদীর শাখা নদী ছিলো সলঙ্গা নদী এবং শুক্রবারের হাটের দিনে পণ্যবাহী নৌকার বিস্তৃতি ঘটতো ঘাটের তীর ঘেঁষে প্রায় দুই/তিন মাইল পর্যন্ত। স্থানীয়দের মতে, শত শত মহাজনী নৌকার সমাগম ঘটত তীরে। এ তথ্য মোতাবেক প্রতীয়মান হয় যে- শুক্রবারের সলঙ্গা হাট হাজার হাজার মানুষে পরিপূর্ণ থাকত। এমন জনসমাগমে তিনশত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বিলেতী পণ্য বর্জনের কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছিলেন আব্দুর রশীদ। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লালিত বখাটে যুবকেরা আব্দুর রশীদের কার্যক্রম সম্পর্কে পাবনার তৎকালীন জেলা প্রশাসককে অবহিত করার সাথে সাথেই প্রশাসন তার আর্মড পুলিশ নিয়ে উক্তস্থানে হাজির হয়। স্থানীয় বখাটেরা আগে থেকেই আব্দুর রশীদের উপর ক্ষিপ্ত ছিলো। কেননা তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবার আগেই ব্রিটিশ শাসক ও তাদের পোষ্য জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাছাড়া জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা গণিকালয় যা 'খিলি পট্টি' বা 'কুড়ে পট্টি' নামে পরিচিত ছিলো, সেগুলোর উচ্ছেদ সাধনে আব্দুর রশিদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন (ফাইজুস সালেহীন (সম্পা.) ২২-২৩)।

পরবর্তীতে এসবের সাথে কংগ্রেসপন্থী কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি জমিদারদের রোষানলে পড়েন। অন্যদিকে চান্দাইকোনা হাটের ঘটনার বদলা নিতে প্রশাসনও সুযোগের সন্ধানে ছিলো। ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি তারা সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। সেদিন সলঙ্গা বাজারস্থ কংগ্রেস অফিস থেকে আব্দুর রশীদ তাঁর কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। এমন সময় পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী আর এন দাস, সিরাজগঞ্জ মহকুমার এস.ডি. ও লর্ড বিজয় কুমার সিংহ রায়ের পুত্র শ্রী সুনীল কুমার সিংহ রায় এবং পাবনা জেলার ইংরেজ পুলিশ সুপার মিস্টার স্মিথ অথবা পিট (চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা ১০৪) চল্লিশ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সলঙ্গা হাটে পৌঁছান এবং কংগ্রেস অফিস থেকে আব্দুর রশীদকে বন্দী করে টেনে হিঁচড়ে হাটের দক্ষিণ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। এতে তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠে এবং জ্ঞান হারান। এসব দেখে সলঙ্গার হাটুরেসহ সাধারণ জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারক মাওলানা সৈয়দ শাহ জিনাতউল্লাহর পৌত্র হিসেবে (চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা ১৭৬) তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিলো। ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের বহু সদস্য মুরীদ ভক্তদের সাথে সকলেই ঘটনার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

আব্দুর রশীদের জ্ঞান ফেরার পর ইংরেজ এস.পি সাহেব পুলিশ প্রহরায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস. ডি.ও সাহেবের দিকে এগিয়ে যায় এবং আব্দুর রশীদকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক কৃষক গরু খেদানোর লাঠি (যার স্থানীয় নাম নড়ি) দিয়ে এস পি সাহেবের মাথায় সজোরে আঘাত করলে তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলে

তিনি জ্ঞান হারান। বাজারের মধ্যকার মদ গাজার বেশ বড় একটা দোকানের মালিক তৎক্ষনাৎ পুলিশ সুপারের সেবায় নিয়োজিত হয়। এদিকে হাটের তিনদিক থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আব্দুর রশীদকে মুক্ত করার জন্য নারায়ে তাকদীর স্লোগান দিয়ে এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশ বাহিনী তাদের দিকে রাইফেল তাক করে হাঁটু গেড়ে বসে অপেক্ষা করছে গুলি ছোঁড়ার আদেশের জন্য। তখন এ বিশাল জনস্রোতকে শান্ত করার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না আব্দুর রশীদ। অন্যদিকে ইংরেজ পুলিশ সুপারের জ্ঞান ফিরলে বেসামাল পরিস্থিতিকে সামাল দিতে গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেন। যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে প্রতিবাদী নিরস্ত্র জনগনের উপর গর্জে উঠে রাইফেলগুলো। অথচ, ঘটনা সামাল দিতে আব্দুর রশীদকে মুক্তি দিলেই জনগণ শান্ত হয়ে যেত, কারণ তারা তাঁর মুক্তির দাবী নিয়ে এসেছিলো। রাইফেলের গুলি গর্জে উঠার সাথে সাথেই সলঙ্গা হাট রক্তাক্ত হয়ে উঠে। জনগণ অতর্কিত এ আক্রমনে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে দলে দলে এগিয়ে আসতে থাকে। অবিরাম গুলি বর্ষণে মারা যায় শত শত লোক (কালীপদ কুন্ডু (সম্পা.) ১৫)। নারকীয় হত্যাকান্ডের প্রমাণ পাওয়া যায় সিরাজগঞ্জস্থ রহমতগঞ্জ নামক কবরস্থানের গণকবরে। স্থানীয় বহু বয়স্ক ব্যক্তি তাঁদের বাবা অথবা দাদার মুখে শুনেছেন সলঙ্গার অগণিত লাশ গুম করতে মহিষের টানা গাড়ীতে করে লাশ আনা হয়েছিলো এবং সিরাজগঞ্জের রহমতগঞ্জ কবরস্থানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল। নিহতের স্বজনেরা লাশ নিতে চাইলেও তাদেরকে লাশ হস্তান্তর করা হয়নি। সলঙ্গা হাটের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে কান্নার আহাজারি শোনা যেত প্রায়ই। এদিকে ঘটনার পরপরই স্থানীয়দের উদ্যোগে বাজারের বেশ কিছু দোকানঘর খালি করে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধপত্রসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আনার ব্যবস্থা করা হয় এবং অনেককেই সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে জানা যায়। সেদিনের সবচেয়ে হৃদয়বিদায়ক ঘটনাটি ছিলো-স্থানীয় বাংলোয় অবস্থান নেয়া ব্রিটিশ বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে সন্তানহারা এক মায়ের আহাজারি। ঐ বিধবা মহিলা তাঁর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া পুত্রের লাশ বুকে জড়িয়ে ধরে বাংলোর উঠানে মাতম করে বলতে থাকেন 'আমার ছাওয়ালকে ফিরায়া দাও'। তাঁর মাতম থামাতে প্রশাসন তাকে কিছু টাকা দিলে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে বলতে থাকেন 'আমার বাবাকে ফিরায়া দাও তোমরা'।

অন্যদিকে রাইফেলের গুলির মুখে উত্তেজিত জনতা হলঙ্গা, ফালা, লাঠিসোটা নিয়ে ঐ বাংলো ঘিরে ফেললে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রশীদকে মুক্ত করে দেন। তাঁর অহিংসবাদী বানীতে উত্তেজিত জনতার ক্ষোভ প্রশমিত হয়। পরবর্তীতে মাওলানা আব্দুর রশীদ তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে আমার সামনেই ৭ জন মারা যায়। এদের মধ্যে উল্লাপাড়ার চাঁদ উল্লাহ, আরজ উল্লাহ ও রাজ আলীর নাম মনে আছে। . . . কত লোক নিহত হয়ে হাটের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো, তার কোন হিসাব ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। যদিও পরবর্তীতে সরকারী তদন্ত রিপোর্টে ৪৫০০ জনের হিসাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, শত শত লোক আহত হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পথে ঘটে, ঝোঁপে জঙ্গলে কিংবা বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেছে তার কোন সঠিক হিসাব আজো পাওয়া যায়নি। অনেকেই সরকারি কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচতে মুখ খোলেনি। উত্তেজিত জনতাকে প্রতিহত করতে সরকারি পুলিশ বাহিনীর ৩৯ টি রাইফেলে কোন গুলি অবশিষ্ট ছিলো না। ঘটনার দিন শুধুমাত্র একটি রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়নি। কেননা, রাইফেলধারী পুলিশ সদস্য ছিলেন একজন বিহারী ক্ষত্রিয়, এবং হাটে প্রচুর গরু বেচা কেনা হত বলে তিনি গুলি ছোঁড়েন নি। মূলত তিনি গো হত্যার পাপে জর্জরিত হতে চাননি বিধায় গুলি ছোড়েন নি বলে প্রশাসনের জবাবদিহিতায় তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে (কালিপদ কুন্ডু (সম্পা.) ১৮-১৯)।

সলঙ্গার ঘটনা: হত্যাকাণ্ড না বিদ্রোহ

ইতিহাস প্রসূত ঘটনা গুলোর নিজস্বতা থেকে সাহজিক নিয়মেই জানা যায় উক্ত ঘটনাটির সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিলো। সলঙ্গার ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড বা বিদ্রোহ রূপে সুনিদিষ্ট করা কঠিন। কেননা, আভিধানিকভাবে হত্যাকাণ্ড শব্দের অর্থ হলো হত্যার ঘটনা বা খুনের ঘটনা (জামিল চৌধুরী (সম্পা.) ১৩৮১)। অন্যদিকে বিদ্রোহ শব্দের অর্থ হলো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধিতা বা ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী বা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান (জামিল চৌধুরী (সম্পা.) ৯৭১)। আভিধানিক অর্থের বিচারে এবং সুস্পষ্ট ধারনা পেতে আমরা সলঙ্গার ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড পরবর্তী বিদ্রোহ বলতে পারি। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন যেকোন রক্তপাত বিরোধী ছিলো বিধায় এ ঘটনাটিকে বিদ্রোহ বললে শাব্দিক ভাবে রক্তপাতের দায়ভার ভারতীয়দেরই নিতে হবে। কিন্তু ভারতীয়রা যেহেতু এ রক্তপাতের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করছিলো না বরং ইংরেজদের উস্কানিমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে এ নৃশংসতার সূত্রপাত ঘটেছিলো সেহেতু স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে সলঙ্গার ঘটনা বিদ্রোহ পরবর্তী হত্যাকান্ড হিসেবেই পরিচিতি পাওয়া যৌক্তিক। কেননা, Indian Penal Code এর সেকশান ২৯৯ এর বরাতে জানা যায়- Culpable homicide-Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offence of culpable homicide. (Asif Ahmed 263).

অন্যদিকে, গান্ধীজীর অহিংস বা অসহযোগ আন্দোলনের আভিধানিক অর্থ হল Peaceful non-co operation বা সরকারের প্রতি জনগনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতামূলক আচরণ (জামিল চৌধুরী (সম্পা.) ২০১৬, ১১৮)। এর প্রায়োগিক দিকটাও ছিলো একই। সলঙ্গার ঘটনাটিকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর উস্কানিমূলক কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ জনগণের ধৈর্য্যচ্যুতির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের পরিচালিত সশস্ত্র আক্রমনকে সার্বিকভাবে হত্যাকাণ্ডই বলা যৌক্তিক।

সলঙ্গা হত্যাকাণ্ড পরবর্তী প্রভাব

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলমান খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সলঙ্গা হত্যাকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯২১ সালে আসামের চা শ্রমিকদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং বহু নারী শিশুসহ আন্দোলনকারীদের হত্যা করে নদীতে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল বলে জানা যায় (ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন ১১৫)। সলঙ্গার নির্মম হত্যাকাণ্ডে পরবর্তী বহু মানুষের লাশ ফুলঝোর নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলো ব্রিটিশরা। তাছাড়া পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। সলঙ্গা হত্যাকাণ্ডের খবরটি স্থানীয়ভাবে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিলো। তবে এটি ইতিহাসে গুরুত্ব সহকারে স্থান না পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনা চলাকালীন হিন্দু জমিদারদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করেন। গবেষণার স্বার্থে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সলঙ্গাস্থ মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগারের কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্রীড়া সম্পাদক জনাব এস.এম ফারুক হায়দারের বরাতে জানতে পারি। তর্কবাগীশের এ আন্দোলনের সাথে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সম্পৃক্ততা ছিলো না এবং তাঁরা এ ব্যাপারে আগ্রহীও ছিলেন না। কারণ, ঐ জমিদারদের অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন।

পতিতালয় বন্ধ, মদ বিক্রি বন্ধসহ অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বগুড়ার শেরপুরে জমিদারদের বাড়িতে গরুর দুধ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এমন প্রতিবাদগুলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে সরকারকে বিভ্রান্ত করেছিলো জমিদারেরা। ফলে সলঙ্গার ঘটনাটিকেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। জনাব ফারুক এসমস্ত তথ্য তাঁর পিতামহ প্রয়াত ময়দান আলীর (মৃত্যু-১৯৭৬ সাল) কাছ থেকে জেনেছিলেন বলে জানান

(সাক্ষাৎকার: এস.এম. ফারুক হায়দার সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৬/০৭/২০২২)। ঘটনার পরদিন অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেস ও খেলাফতপন্থী নেতা কর্মীরা ছুটে আসে সলঙ্গায়। সমমনা বহু ব্যবসায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং বহু চিকিৎসক বিনা খরচে আহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন বলে জানা যায়। চার হাজারেরও অধিক লোক মারা যাওয়ার এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানায় তৎকালীন আনন্দবাজার ও অমৃত বাজারসহ কয়েকটি পত্রিকা (মোঃ তয়েজ উদ্দিন মন্ডল (সম্পা.) ৩৪)। যদিও ইংরেজ সরকার সেসব দাবিকে অগ্রহ্য করে তাদের নৃসংশতা চালিয়ে গেছে পুরো আন্দোলনের যুগে।

দেশ বিভাগ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার নিজস্বতার কোন রাষ্ট্রীয় সম্মান ছিলো না এমনকি এই তাঁবেদার গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার একান্ত বৈশিষ্টগুলোকে নির্জীব করতে ব্রিটিশদের মতোই উপনিবেশিক আচরণ করে গেছে এ জনপদের সাথে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন ধারার উত্থান পতনে প্রায় বিস্মৃত সলঙ্গা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। উক্ত স্থান পরিদর্শনকালে স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে আলাপচারিতায় তাঁদের মনোকষ্টের কথা জানা যায়। তাঁদের কাছে এ ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে একটি জ্বলজ্বলে অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। যে মাঠে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিলো সেখানে ২০০৬ সালে স্থাপিত একটি অস্পষ্ট স্মৃতিফলক ছাড়া কিছুই নেই। ঘটনাস্থলের নিকটেই সমাজ কল্যাণ সমিতি পরিচালিত মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগার রয়েছে। এ পাঠাগার সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয় সমাজ কল্যাণ সমিতি। আশির দশক থেকে প্রতিবছর ২৭ জানুয়ারি সলঙ্গা দিবস উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে তরুণ প্রজন্মের কাছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সলঙ্গা হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান উক্ত পাঠাগারের কার্যনিবাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান।

মাওলানা আব্দুর রশীদের পারিবারিক পরিচয় ও রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার তারুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (মোঃ মনিরুজ্জামান ৪১)। তাঁর পিতা হযরত আবু ইসহাক (র.) উত্তরবঙ্গের একজন পীর ও সুখ্যাতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। এই আলেম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর বংশধর (মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ২৬১)। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় স্বাভাবিকভাবে ছোটবেলা থেকেই আব্দুর রশীদ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। সমসাময়িক জ্ঞান অন্বেষণে তিনি স্থানীয় ডায়মন্ড জুবিলী ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং এন্ট্রান্সে পড়াকালীন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এর পূর্বেই তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো মানসিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে নির্যাতিত কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের একত্রিত করে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সে সময় স্থানীয় হাটে বাজারে গড়ে উঠা 'খিল্লিপট্টি' বা 'কুড়েপট্টি' নামে পরিচিত গণিকালয় উচ্ছেদ করেন তিনি।

এমন সামাজিক সংস্কার অভিযান চলাকালীন অত্র এলাকার মুসলিম জাগরণের অন্যতম সংগঠক কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (জন্ম-১৮৭৯/১৮৮০ - মৃত্যু-১৯৩২) (এম, সেরাজুল হক ০১; সারোয়ার জাহান, ০৩) সাহচর্য লাভ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম' নামক সংগঠনে যোগ দেন (শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) ৯২)। এ সংগঠনের মূলমন্ত্র ছিল ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তা বাস্তবতার নিরিখে একই সূত্রে গাঁথা; ধর্মকে কেবল বিশ্বাস ও প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জগত-জীবন, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা (বদিউজ্জামান ২৮৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *সাপ্তাহিক ছোলতানে* প্রকাশিত *স্বরাজ ও হিন্দু-মুসলমান* নামক প্রবন্ধে

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম' নামক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আমরা পাই (সাপ্তাহিক ছোলতান ০৫)। আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ উক্ত সংগঠনের কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে যুক্ত হন কংগ্রেসের সাথে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের অফিস গঠন করে ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে নিমগ্ন হন। সলঙ্গা বাজারে তাঁর নেতৃত্বে বিদেশী পন্য বর্জনে কর্মসূচীর পরবর্তী পদক্ষেপে ঘটে যায় এক নির্মম হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় ইংরেজদের অভিযোগে তিনি প্রায় ছয় মাস কারাগারে শাস্তি ভোগ করেন এবং এর পর তিনি ইসলামী জ্ঞানান্বেষনে লাহোরে যান। সেখানে তিনি হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং তর্কশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করে 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির আমন্ত্রনে টাঙ্গাইলের প্রজা সম্মেলনের যোগ দেন মাওলানা তর্কবাগীশ। উক্ত সম্মেলনে তিনি পরিচিত হন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে। ১৯৩৩ সালে তিনি 'রায়ত-খাতক সমিতি' গঠন করেন এবং কৃষকদের জন্য ঋণসালিশী আইন প্রণয়নের উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হন (সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) ৪৩)। তাঁর একক প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলার কৃষকদের উপর থেকে তৎকালীন ২৫০ কোটি টাকার ঋণ মওকুফ করা হয় এবং এ বিশেষ সাফল্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'শেরে বাবুর' উপাধি দিয়েছিলেন (মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ২৬৫)। পরবর্তীতে, ১৯৩৬ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ সালে সিরাজগঞ্জ মহকুমা থেকে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য পদ লাভ করেন। পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের নিয়ে মাওলানা তর্কবাগীশ গণভোট কমিটির জন্য কাজ করতে সিলেট গিয়েছিলেন (শেখ মুজিবুর রহমান ৭৫)। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে মাওলানা তর্কবাগীশ পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন (মোঃ মনিরুজ্জামান ৪১)। তিনি ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাবনা-২ আসনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী বছরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মুজিব নগর সরকার গঠনে সহায়তা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগঠক হিসেবে তিনি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সার্বভৌম বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন এ বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় এ মতবাদের ভিত্তিতে তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হলে তিনি ১৯৭৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন (মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ; ২৬৮,২৬৯)। এতে তাঁর উন্নত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে; কেননা ইসলামী ধর্মগ্রন্থের ভাষা আরবী হলেও এর মমার্থ বুঝতে মাতৃভাষা অপরিহার্য এমন সুগভীর ধারণা বর্তমানের বহু মুসলিম ব্যক্তিত্বের মাঝে অনুপস্থিত। ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিকজান্তা এরশাদের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এ সময় তিনি 'গণ আজাদী লীগ' প্রতিষ্ঠা করে অন্যায়ের বিরোধিতা করেন (কালীপদ কুন্ডু (সম্পা.) ১৯)।

তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে তিনি আজীবন গণমানুষের দূর্দশা লাঘবে কাজ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এ বলিষ্ট নেতা সর্বদা বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরাধা ছিলেন; যা তাঁর কর্মে প্রমাণিত। ১৯৮৬ সালের ১৫ আগষ্ট তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২০ আগষ্ট ভোরে তিনি ঢাকার পি.জি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ফাইজুস সালেহীন (সম্পা.) ৪৮)।

উপসংহার

বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে- সলঙ্গার ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পরিচালিত বর্বরোতম হত্যাকাণ্ড। অহিংস আন্দোলনকারীদের উপর ইংরেজ গুর্খা সৈন্যরা বরাবরই গুলি চালিয়েছিলো নয়ত লাঠিপেটা করেছিলো। কিন্তু সলঙ্গার ক্ষেত্রে ইংরেজদের নির্যাতন সহনশীলতার মাত্রা ছড়িয়ে গিয়েছিলো এবং এক্ষেত্রে অবাক করা বিষয়টি হলো স্থানীয় ক্ষমতাসীন জমিদারেরা ভাবলেশহীনভাবে ইংরেজদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আন্দোলনের গুরুত্বকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিলো। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর এহেন আক্রমন প্রমাণ করে অহিংস আন্দোলনে সরকার দারুন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং এজন্যই সমঝোতার পরিবর্তে সরাসরি সশস্ত্র আক্রমনে লিপ্ত হয়। সকল মানবিকতা লজ্ঘন করে তারা সাধারণ এবং নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে বিদেশী পণ্য বর্জন কর্মসূচীর মাধ্যমে সলঙ্গা বাজারে ইংরেজদের বিরোধিতা করে জনগণের মাঝে যে গভীর জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাতে স্থানীয় জমিদার শ্রেণির ইংরেজ আনুগত্যে ভাঙ্গনের কম্পন শুরু হয়েছিল। অস্তিত্ব সংকট কাটিয়ে উঠতে সেসব জমিদাররা একত্রিত হয়ে ইংরেজ বাহিনির সাথে যুক্ত হয়ে স্বজাতির প্রতি অমানবিক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। যদিও আপাত পরাজয় ঘটেছিল আন্দোলনকারীদের। তবে এ পরাজয় পরাধীনতার শিকল থেকে চির মুক্তি এনে দিয়েছিল পরবর্তীতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিজয় সুনিশ্চিত এবং সলঙ্গার ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক নিদারুন ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় পর্যায়ে এ ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেশের তরুণ প্রজন্মের চিন্তায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উম্মেষ ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

তথ্যসূত্র

এম সেরাজুল হক, *শিরাজী চরিত*, শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।

আখতার উদ্দিন মানিক, *সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা, ২০১৬।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুক্তধারা, ১৯৬৪।

আয়েশা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২।

ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, *ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৩।

কালিপদ কুন্ডু (সম্পা.), *স্বাধীনতার রক্তসিড়ি সলঙ্গা দিবস ও মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগার*, যুগপূর্তি স্মরণিকা, মাওলানা তর্কবাগীশ পাঠাগার, ২০০৩।

কালিপদ কুন্ডু (সম্পা.), *সলঙ্গার ইতিকথা ও সলঙ্গার* ঐতিহাসিক ঘটনার *ইতিবৃত্ত*, ঐতিহাসিক সলঙ্গা দিবস স্মরণিকা, হাজেরা পাবলিকেশান্স, ২০০৬।

কালীপদ কুন্ডু (সম্পা.), *রক্তাক্ত সলঙ্গা বিদ্রোহ দিবস*, হাজেরা পাবলিকেশান্স, ২০১৭।

চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, *জিলা পাবনার ইতিহাস*, তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ১৯৮৬।

জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১৬।

প্রেমেন আডডি, ইবনে আজাদ, *বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ*, মুক্তধারা, ১৯৮৮।

ফাইজুস সালেহীন (সম্পা.), *মহানাগরিক* (৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা), ডেফোডিল প্রিন্টাস, ১৯৯০।

বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৪।

মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *সিরাজগঞ্জের গুনীজন*, গতিধারা, ২০২২।

মোঃ তয়েজ উদ্দিন মন্ডল (সম্পা.), *চলনবিল জাদুঘর স্মরনিকা অনুসন্ধানী*, অনুসন্ধানী, ১৯৮৭ ।

মোঃ মনিরুজ্জামান, *আলোকিত সিরাজগঞ্জের জ্ঞানী-গুনীজন*, জ্যোতিপ্রকাশ, ২০০৭।

মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী, *বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০০৪।

মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনীতি*, তৃতীয় চোখ, ২০১৯।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা:), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-সিরাজগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, ২০০৪।

শান্তিময় রায়, *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান*, মুক্তধারা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।

সত্যেন সেন, *ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭।

সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, গতিধারা, ২০০৯।

সারোয়ার জাহান, *শিরাজী: জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা পিডিয়া*, (খন্ড-২), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

সাপ্তাহিক ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা, ১৮ই মাঘ ১৩৩০।

সাক্ষাৎকার: এস.এম. ফারুক হায়দার বয়স ৪৬, পিতা মৃত মোঃ জামালউদ্দিন, মাতা মৃত হাবিবুন্নাহার, পিতামহ মৃত ময়দান আলী, গ্রাম: ধবিল মেহমলিশাহি, থানা সলংগা, উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : মাওলানা কর্তবাগীশ পাঠাগার, সলঙ্গা বাজার, সিরাজগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৬/০৭/২০২২।

হাসিনা আখতার, *জিন্না গান্ধী সম্পর্ক ও সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস*, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ২০১৩।

হোসেন উদ্দীন হোসেন (সম্পা.), *বাংলার বিদ্রোহ*, (৬০০-১৯৪৭), অমল সেন, *নড়াইলের তেভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা*, (পৃ. ১৯), বিদ্যাপ্রকাশনা, ১৯১৯।

Ashraf Siddiqui, *Bangladesh District Gazettteers Rajshashi*, Bangladesh Government Press, 1976.

Asif Ahmed, *The Penal Code- 1860*, Morshed Law Book House, 2018.

Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazettteers Pabna*, Bangladesh Government Press, 1978,

Ram Gopal, *A Political History 1858-1947*, Asia Publishing House, 1959.